



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 415 - 421

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘পক্ষ- বিপক্ষ’ উপন্যাস : ক্ষমতা, শোষণ ও গ্রামজীবন

সুতপা পাল

গবেষক, মেদিনীপুর কলেজ (স্বশাসিত)

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: paulsutapa.1993@gmail.com

 0009-0008-4390-0507

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Decentralization
of power,
exploitation,
Panchayat system,
land reform,
corruption,
opportunism,
opponents,
politics.

Abstract

The socio-economic changes of rural Bengal in the seventies and eighties have been reflected with great importance in Bengali literature. In particular, many fiction writers, including Tapan Banerjee and Abhijit Sen, have created plots for stories and novels in Bengali literature focusing on the deep conflict that the rise of the new panchayat-centered politics created in the social life of the people of rural Bengal. Sadhan Chatterjee has also presented the picture of the political evolution of rural Bengal in his stories and novels with rare courage. After 1977, the Left Front government came to power and gave priority to democratic decentralization to provide facilities to the rural people within the parliamentary structure. That is, the Left government tried to decentralize power in 1978 by implementing the three-tiered panchayat formation planned in 1973 and the Operation Barga program. But the dark times of this rural reform-oriented politics approached a little further ahead. The black shadow of corruption tarnished the party. And as a result, darkness descends on the lives of the rural people. As the form of politics changes, the form of people gradually changes. Greed and lust, disappointment in personal life drag people into the politics of violence. The article under discussion attempts to analyze Sadhan Chatterjee's novel 'Paksha-Vipaksha' by keeping in mind another form of exploitation from the decentralization of power.

Discussion

বাংলা কথাসাহিত্যে রাজনীতিমনস্ক ও রাজনীতি সচেতন লেখকদের মধ্যে সাধন চট্টোপাধ্যায় হলেন অন্যতম একজন। ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের (১৯৬৬) সঙ্গে যুক্ত থাকা এই লেখকের লেখনী জুড়ে রাজনীতির ছবি স্পষ্ট। তাঁর লেখা গল্প উপন্যাসের কাহিনীতে কাহিনীতে রয়েছে সত্তর দশকের উত্তাল রাজনীতি নকশালবাড়ি আন্দোলন থেকে সত্তর পরবর্তী পরিবর্তিত সমাজ-রাজনীতির গভীর প্রভাব। সময়, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতির নানান দিককে সামনে রেখে তিনি সাহিত্যে বুনেছেন মানুষের সংস্কৃতি তথা দৈনন্দিন জীবন যাপনকে। বহমান এ জীবন, বহমান এ সমাজকে দলিলীকরণ করেই তিনি

তাঁর লেখক সত্তাকে এক নতুন পথ দিয়েছেন বলা যায়। বিশেষত, পশ্চিমবাংলার গ্রাম সমাজের প্রেক্ষাপটে লেখা গল্প উপন্যাসগুলিতে গ্রামীণ রাজনীতির বিবর্তনের যে চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তা এককথায় অনস্বীকার্য।

ষাট-সত্তরের কাল ছিল পশ্চিমবঙ্গীয় রাজনীতির উত্তাল পরিস্থিতির কাল। কংগ্রেস জমানায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তখন সমাজ এবং মানুষের জীবনও বয়ে চলেছিল নানান চড়াই উতরাই এর মধ্য দিয়ে। বিশেষ করে তৎকালীন সরকারের প্রচলিত নানান নীতির বিরুদ্ধে গ্রাম থেকে শহর জুড়ে একের পর এক আছড়ে পড়ছে প্রতিবাদের ঢেউ। একদিকে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকদের লড়াই, অন্য দিকে গরিব ‘মেহনতী’ শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লব। সরকারের সঙ্গে তাঁদের নানান রাজনৈতিক সংঘর্ষে একটু একটু করে বদল ঘটে অবস্থার। বদল ঘটে প্রশাসনিক ক্ষমতার। ১৯৭৭ এর নির্বাচনে কংগ্রেস শাসনের পরাজয় ঘটলে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতায় পদার্পণ করে বামফ্রন্ট সরকার। তখন থেকেই শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক পট পরিবর্তন। এর আগে কংগ্রেস শাসনকালে গ্রামীণ অর্থনীতি স্থিতিশীল অবস্থায় থাকলেও, গ্রামের কৃষির বিকাশ সেভাবে ঘটেনি বললেই চলে। কারণ গ্রামের অধিকাংশ মানুষই ছিলেন তখন ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। আর জমি ছিল গ্রামের বড় কৃষকদের অধীনস্থ। যে কৃষক শ্রেণির ১০ হেক্টরেরও বেশি জমির মালিকানা ছিল। এদেরই ক্ষমতায় থাকা গ্রামগুলিতে সেদিন না ছিল শিক্ষা, না ছিল স্বাস্থ্য, না ছিল পানীয় জল আর বিদ্যুতের আলো। ছিল গ্রাম জুড়ে শুধুই কর্মহীনতা, হতাশা, দারিদ্র্য। এমন অবস্থায় বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আগমনে গ্রামীণ উন্নয়নের পথে কিছুটা আশার আলো জ্বলে ওঠে। ক্ষমতা পেয়ে সেদিন বাম সরকার শুরু করে সংস্কারের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ কাঠামোর সংস্কার। যে সংস্কারের মূল কথা জনগণের অংশগ্রহণে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ। তৈরি হয় অপারেশন বর্গা কর্মসূচি। গ্রামের বর্গাদার বা ভাগ চাষিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, উৎপাদিত ফসলের গুণগত মান উন্নয়ন এবং ফসলের ভাগ বৃদ্ধির সঙ্গে ভাগচাষিদের নাম কাগজে কলমে নথিভুক্ত করে তাঁদের নিশ্চিত সুরক্ষা দেওয়াই হল অপারেশন বর্গা কর্মসূচি। যে কর্মসূচির বাস্তবায়ন ঘটে নতুন এক ধরনের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে। বাম সরকার ১৯৭৮ সালেই প্রথম ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে গ্রাম, ব্লক বা সমিতি এবং জেলা স্তরে নির্বাচিত সংস্থার মাধ্যমে। যা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের একটি অন্যতম সফল উদ্যোগ। মূলত এই দুই কর্মসূচির মিলিত প্রয়াসের মধ্য দিয়েই সেদিন শুরু হয় বাম আমলের জয়যাত্রা। কিন্তু আলোর পরে অন্ধকার ঘনিয়ে এলে তাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের এই ব্যবস্থায় এরপর যে সীমাবদ্ধতাগুলি ধরা পড়ল তাতে দুর্নীতির প্রশ্ন উঠে এল। আলোচ্য প্রবন্ধে এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নীতি-দুর্নীতির পটভূমিকায় সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘পক্ষ-বিপক্ষ’ উপন্যাসটি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছে। বলা ভালো, আমার এই বিশ্লেষণে চেষ্টা রয়েছে গ্রামীণ মানুষের ক্রমশ বদলে যাওয়া জীবনকে খুঁজে দেখার। চেষ্টা রয়েছে কেমন করে গ্রামীণ মানুষগুলি এই নবরূপী শোষণের ধাক্কায় প্রবহমান স্রোতে ভেসে গেল? কেমন করে মেনে নেওয়া বা মানিয়ে চলা না চলার টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই বিভ্রান্তিময় কৃত্রিম এক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল?

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার একটা সুনির্দিষ্ট ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসে দেখা যায় ব্রিটিশ আমলে পল্লী চৌকিদার আইন (১৮৭০), বঙ্গীয় স্বায়ত্ব শাসন আইন (১৮৮৫), বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্ব শাসন আইন (১৯১৯) প্রভৃতি আইনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কংগ্রেস শাসনকালেই পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত কাঠামো একটা সুস্পষ্ট রূপ পেতে শুরু করে। এরপর ১৯৫৭ সালে ‘বলবন্ত রাও মেহেতার কমিটি’র সুপারিশ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম সরকার কর্তৃক পঞ্চায়েত আইন প্রণোদিত হয়। যে আইন অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং অঞ্চল পঞ্চায়েত - এই দ্বি-স্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এরপর ১৯৬৩ সালে জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী ব্লক পর্যায়ে আঞ্চলিক পঞ্চায়েত এবং জেলাস্তরে জেলা পরিষদ যুক্ত হয়। ফলে ১৯৫৭ ও ১৯৬৩ এই দুই সালের দুই আইন পশ্চিমবঙ্গে চার-স্তরীয় একটি বিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তোলে - গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা পরিষদ। কিন্তু পরবর্তীকালে এই চার স্তরের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নানান ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়ে। তখন চার স্তরের বদলে ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত গঠনের একটি বিলও সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত হয়। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভার মন্ত্রী হন সুরত মুখোপাধ্যায়। তাঁর উদ্যোগেই ১৯৫৭ ও ১৯৬৩ সালের পঞ্চায়েত আইনের এই চার স্তরের পঞ্চায়েত কাঠামোকে বাতিল করে ত্রি-স্তরীয় নতুন এক পঞ্চায়েত আইন (১৯৭৩) রাজ্য বিধানসভায় পাশ হয়। যে আইনে

তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং মহিলাদের আসন সংরক্ষণ করে নির্বাচনে মনোনীত করার কথাও বলা হয়। এরপর ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে নতুন এই পঞ্চায়েত আইনের বাস্তবায়ন ঘটায়।

“১৯৭৮ সালের ৪ঠা জুন একই দিনে তিন স্তরের পঞ্চায়েত সংস্থায় (গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ) প্রত্যক্ষ নির্বাচন রাজনৈতিক মতাদর্শ ও দলীয় প্রতীকের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। ...এক হৃদযতাপূর্ণ ও শান্তিময় পরিবেশে গ্রাম বাংলার ২. ৫ কোটি ভোটার অসীম উৎসাহে ৩০ হাজার নির্বাচনী এলাকায় ৫৬ হাজার পঞ্চায়েত প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।”

তৎকালীন রাজ্য সরকার প্রশাসনিক স্তরে সাধারণ মানুষের যোগদানকে সুনিশ্চিত করতেই এই ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনকে প্রাধান্য দেয়। বলাবাহুল্য, ১৯৭৭ এর পর থেকে পঞ্চায়েতের নেতৃত্ব কাঠামোয় গ্রাম স্তরে ধনী এবং মধ্যবিত্ত কৃষকদের পরিবর্তে ধীরে ধীরে প্রবেশ ঘটেছে বর্গাদার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কুটির শিল্প, বেকার যুবক-যুবতীদের। তবে সমিতি এবং জেলা স্তরে শিক্ষকদের উপস্থিতি জোরালো ছিল। ফলে নতুন পঞ্চায়েত নীতি অনুসারে নয়ের দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত কাঠামো অনেক বেশি গণতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। এই গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের তত্ত্ব আলোচনায় অসিত কুমার বসু লিখেছেন –

“ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট জীবনধারা। ...এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্যক্তি সম্প্রদায় এবং জাতির সর্বোচ্চ সম্ভাবনা বিকাশের জন্য সর্বাধিক সংখ্যক লোকের নিকট সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা উন্মুক্ত করে দেওয়া। গণতন্ত্র শুধু যে একটি জীবনধারা তাই নয়, এটি একটি রাষ্ট্রশাসন প্রণালীও।”

যাইহোক, পঞ্চায়েতের তিন স্তরে এ সময় ৭১,১২০ টি আসনের মধ্যে তফসিলি জাতি-উপজাতিভুক্ত মহিলা সদস্যই মোট ২৪,৮৯৫ জন নির্বাচিত হয়েছিলেন। ফলে পঞ্চায়েতে আসন সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে গ্রামের নিম্ন-মধ্যবিত্ত, অল্প শিক্ষিত সাধারণ তফসিলি জাতি, উপজাতিভুক্ত পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মহিলারাও তাঁদের নিজস্ব আর্থসামাজিক অবস্থানটি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। বলাবাহুল্য, এই অবস্থান বাস্তবিকই বদলে যাওয়া গ্রাম বাংলাকে চিহ্নিত করে।

১৯৮৮ সালে প্রকাশিত ‘পক্ষ-বিপক্ষ’ উপন্যাসে সাধারণ মানুষের সেই অবস্থানের চিত্রটি রয়েছে। যুগবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাদল কর্মকার ছিল অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত। প্রধান হবার আগে গ্রামে যার পরিচিতি ছিল ‘কুলোকেনো কামার’ এবং হাতুড়ে ‘কামার ডাক্তার’ নামে। যে সংরক্ষিত আসনে মনোনীত হয়েছে। এছাড়াও পঞ্চায়েতের অন্যান্য সদস্য পদে যুক্ত চরিত্রগুলি যেমন প্রশান্ত, গোকুল, ধ্রুবর মতো অনেকেই গ্রামের একদম সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত তফসিলি জাতিভুক্ত মানুষ। যারা পঞ্চায়েতের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করছে। অর্থাৎ বাম আমলে গ্রাম স্তরের ক্ষমতাকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ যে সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে তার একটা সুস্পষ্ট ছবি উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বাম আমলের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে মূলত সিপিআই(এম) দলের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিকে ভিত্তি করে। পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরেই পরিচালন কমিটি রয়েছে - লোকাল কমিটি, জেনারেল কমিটি এবং জেলা কমিটি। এই কমিটি গুলোই পঞ্চায়েতের কাজের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিত। উপন্যাসে এই দিকটিও সাধন চট্টোপাধ্যায় চরিত্রগুলির অবস্থানে স্পষ্ট দেখিয়েছেন –

“প্রশান্ত সিকদার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ব্লক অফিসে বসে। অনুপম লোকাল কমিটির মেম্বর। আর নিশিকান্ত সক্রিয় রাজনীতি না করলেও শিক্ষক আন্দোলনে জেলা স্তরের নেতা। এদের সঙ্গে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই গোপন বৈঠক হয়।”

যাইহোক, কালক্রমে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ফুটে ওঠে বাম সরকারেরও সংসদীয় ব্যবস্থার অতল গভীরে ডুবে যাওয়ার ছবি। একদিকে যেমন সমাজে বুর্জোয়া শ্রোত বৃদ্ধি পেল, তেমনি বড় হয়ে উঠল পার্টির আমলাতান্ত্রিক মনোভাব। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাতেও দেখা গেল এক শোষণের বদলে আর এক শোষণের ছবি। দেখা গেল কাটমানি খাওয়া, গ্রামীণ উন্নয়নের অর্থে নিজের পকেট ভরা, স্বজন-পোষণ দুর্নীতির নানান কুৎসিত রূপ। স্বার্থের সংঘাতে তৈরি হল দলের মধ্যে উপদল। ফলে সংসদীয় কাঠামোয় থেকে বাম সরকার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে যে সামন্ততান্ত্রিক শোষণকে নির্মূল করতে চেয়েছিল, সেই সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হলেও শোষণ থেকে গেল অন্য এক রূপে। শোষণের এই রূপটিকেই সাধন চট্টোপাধ্যায় উপন্যাসে

বিশেষভাবে তুলে ধরলেন। যেখানে মানুষের নৈতিকতা, আদর্শ ও স্বার্থের সংঘাতটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। ‘পক্ষ-বিপক্ষ’ উপন্যাসটি শুরুই হয়েছে যুগবেড়িয়া নামক একটি গ্রামের পঞ্চায়েত বোর্ড মিটিং এর ছবি দিয়ে। এবং যে গ্রামের সরকারি দলের পঞ্চায়েত প্রধানের করা দুর্নীতির বিরুদ্ধে দলেরই এক যুবক সদস্য গোকুল ভাঙ্গির প্রতিবাদে বোর্ড মিটিং রীতিমতো উত্তপ্ত। অতীতে বামপন্থীদের করা একাধিক গণআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা বলিষ্ঠ এক নেতা গগন ভাঙ্গির ছেলে এই গোকুল। তাই তার মধ্যেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে গলা তোলার অসীম সাহস এবং জেদ স্পষ্ট। লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায় গোকুলের মধ্য দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা এক বলিষ্ঠ নেতৃত্বকে যেমন দেখিয়েছেন, তেমনই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে আট এর দশক থেকে গ্রামীণ রাজনীতির এক জটিল রূপকে সামনে এনেছেন।

উপন্যাসের কাহিনি এগোলে নায়িকা চরিত্র দুলালীর আগমন ঘটে। যুগবেড়িয়া পঞ্চজিনী উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষকতা করে সে। এই বিদ্যালয় তার দাদু বিভূতি মন্ডলের মায়ের নামে। তার মামা শচীনন্দন বর্তমানে এই বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির মেম্বর। লেখক দুলালী এবং তার পরিবার এর এই বিষয়ে স্বজন পোষণের একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন।

“জুলজিতে অনার্স হওয়ার পর পার্টি সোর্সে কালনা, মন্তেশ্বর এবং মেমারির হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে চাকরির সুযোগ পেয়েও যুগবেড়িয়া উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সে ছাড়েনি।”^৪

কারণ এই বিদ্যালয় দুলালীর আবেগ। তাই ঠিক মতো পারিশ্রমিক না পেয়েও এই বিদ্যালয়ে সে থেকে গেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মাতিয়ে রেখেছে। এহেন দুলালীর সতীর্থ বন্ধু গোকুল ভাংগি। যে গোকুলকে নিয়েই পঞ্চায়েতের বোর্ড মিটিংয়ে এত সমস্যা। যে গোকুল পার্টির জন্মলগ্ন থেকে পার্টিকে ভালোবেসে মানুষের জন্য লড়াই করছে। যে গোকুল কংগ্রেস অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করা এক সৈনিকের পুত্র। প্রতিবাদ যার রক্তে। সেই গোকুলকে পার্টিতে কোণঠাসা করে রাখতে চায় বাদল কর্মকার, প্রশান্ত, ধ্রুব গুপ্তের মতো দু’দিন আগে আসা কিছু সুবিধাবাদী, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী। কিন্তু দুলালীর মতো লড়াকু, সাহসী, শিক্ষিতা, আধুনিক মেয়ের বিবেক বারবার গোকুলেরই পক্ষ নেয়। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় স্বার্থের সংঘাতে দলের মধ্যে উপদল তৈরির এই পটভূমিকায় গোকুল ও দুলালীর একে অপরের প্রতি প্রচ্ছন্ন ভালোবাসা উপন্যাসের কাহিনিকে দ্বন্দ্বিক মাত্রায় এগিয়ে দিয়েছে।

সুযোগ-সুবিধা বুঝে দলবদল বাম আমল থেকে আজ পর্যন্ত সরকারি দলের খুব সাধারণ ছবি। উপন্যাসেও পক্ষ-বিপক্ষের ছক বদলের খেলা লক্ষ করা যায়। বাদল কর্মকার, প্রশান্ত শিকদারের মতো মানুষেরা বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে বসেছিল বাম বিরোধী নেতৃত্বের আসনে। এখন এরাই গ্রামের ক্ষমতাকেন্দ্রের অধিকর্তা। দুলালীর মামা শচীনন্দন তাদেরই একজন। অথচ অতীতে এই বাম পার্টির নেতৃত্বে থাকার অপরাধেই বর্গা চাষি গগন ভাঙ্গিকে জমি থেকে উচ্ছেদের সব চেষ্টাই সে বাদল ডাক্তারের সঙ্গে মিলে করেছে। গোকুল, পশুপতির মতো যারা আদর্শের সঙ্গে পার্টিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, শচীনন্দন, বাদল কর্মকারের মতো আদর্শহীন নেতারা তাদের বাধা দিতে চায়। একদা খাস জমি উদ্ধার, বর্গা রেকর্ড, সিলিং নির্ধারণ করার কাজগুলি সম্ভব হয়েছিল এই গোকুল পশুপতিদের সক্রিয় উদ্যোগেই। তাই তাদের দল থেকে উচ্ছেদ করার ক্ষমতা এদের নেই। কিন্তু দলের মধ্যে কোণঠাসা করে রাখার সব রকম প্রচেষ্টা তারা চালিয়ে যায় প্রতিনিয়ত। যেমন চারটে আম গাছের আগাম টাকা দেওয়ার প্রমাণ না থাকায় যোশো পাত্রের সঙ্গে গাঁয়ের মাহিষ্য জাতি ও বনেদি কংগ্রেসী হাজারীর রক্তারক্তি হয়ে যায়। এতে সালিশি সভা বসিয়ে গোকুল ৫০ টাকা ফাইন দেওয়ার নিধান দিলে গরিব যোশো পাত্র সংকটে পড়ে। কিন্তু হাজারীর সন্তুষ্টি হয় না। হাজারী চেয়েছিল রক্তের বদলা নিতে। তার মতে—

“যোশোকে পিঠমোড়া বেঁধে যদি পঞ্চাশ ঘা জুতো মারা যেত, খানিকটা ন্যায্য বিচার বলা যেত।”^৫

ফলে লোভী, মূল্যবোধহীন হাজারী অসন্তুষ্ট হয়ে ধ্রুব গুপ্তের শরণাপন্ন হয়। আর গোকুলের প্রতিপক্ষ ধ্রুব গুপ্ত প্রতিশোধ নিতে আবগারি দপ্তর দিয়ে গোকুলের এলাকার ‘চুল্লুর ঠেকে’ রেড করিয়ে দেয়। ফলে ধরা পড়ে পাখির মতো স্বামী পরিত্যক্তা মেয়েরা, যারা এই চোলাই ব্যবসার মতো অসৎ উপায় অবলম্বন করেই কোনোক্রমে নিজের পেট চালায়, চার চারটি সন্তানের মুখে খাবার তুলে দেয়। বাস্তবিকই, এভাবেই দিনের পর দিন একই দলের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ‘দেখে নেব’ বা ‘এর শেষ দেখে ছাড়ব’র নোংরা খেলায় মেতে উঠে। যেখানে আদর্শ নয়, ক্ষমতার লড়াই বড়। তার থেকেও বড় স্বার্থসিদ্ধি লাভ। আর

গোকুলের মতো যারা আদর্শকে বাঁচাতে চায়, তারা ক্রমশ পার্টিতে একঘরে হয়ে পড়ে। ফলে একটা বিভাজন দলের মধ্যেই তৈরি হয়। আবার ধ্রুব গুপ্তের মতো সুবিধাভোগী, লোভী, ঈর্ষান্বিত মানুষরা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য গোকুলের মতো প্রতিপক্ষ নেতার পক্ষ নিতেও ছাড়ে না। ব্যাংক লোন পেয়ে উৎপল লরি কিনলে ধ্রুব ঈর্ষান্বিত হয়ে নিজেও লোনের চেষ্টা করে। কিন্তু লোন না পেয়ে সে হয়ে ওঠে উৎপলের প্রতিপক্ষ। তখন সে গোকুলের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে চায়। তাছাড়া গ্রাম ঘুরে তিল ও পাট কিনে সেগুলো বাইরে অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় করতেও গোকুলকে তার ভীষণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রয়োজন মিটে গেলে ক্ষেতমজুরদের মজুরি নিয়ে বিবাদকে কেন্দ্র করে আবার সে গোকুলের পক্ষ ছেড়ে ফিরে যায় পুরনো বৃত্তে - উৎপলের দলে। আসলে যে রাজনীতি কেবল পাইয়ে দেওয়া সুবিধার নীতিতে চলে, সেখানে আদর্শ বা দায়বদ্ধতার কথা থাকে না। থাকে শুধু লোভ আর লোভ। ব্যক্তি স্বার্থ সেখানে মুখ্য হয়ে রাজনীতিকে ক্ষমতার খেলায় পরিণত করে। শুধু ধ্রুবের মতো নেতা স্থানীয় মানুষেরা নয়, গোকুলের পাশের গ্রামের সাধারণ মানুষ বিষ্ট ফোড়ে সেও তো 'মহা সুযোগসন্ধানী', 'যখন যার ক্ষমতা তার দিকে ঢলে পড়ে।' ধ্রুব গুপ্তকে তোষামোদ করে তার সুপারিশে লোন পেয়ে ভ্যান কিনে বিষ্ট ব্যবসা করে। এভাবেই দিনের পর দিন নেতারা নিজেদের স্বার্থে জনতাকে ব্যবহার করতে বিষ্টের মতো সাধারণ মানুষদের তাত্ক্ষণিক কিছু সুবিধা পাইয়ে দিয়ে ভুলিয়ে রাখে। আর সাময়িক সুবিধাটুকু পেয়েই মানুষ দারুণ 'উন্নয়ন' ভেবে হুজুগে ভেসে যায়। উপন্যাসের প্রতিটি বাঁকে রয়েছে এই ক্ষমতাতন্ত্রের আশ্রয় ও তার ভয়ংকর পরিণাম। অন্যদিকে পার্টির ভেতরের এই সংঘাতের মধ্যে পড়ে যায় গোকুল-দুলালীর সম্পর্ক। যুগবেড়িয়ার বর্ধিষু মন্ডল পরিবারে পিতৃহারা দুলালী মানুষ। গোকুলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা শুধু মন্ডল পরিবার নয়, পার্টির কেউই ভালোভাবে নেয় না। তাছাড়া অতীতে তার নকশালী ঝোঁকের ইতিহাসও রয়েছে। ফলে গোকুলের সঙ্গে মেলামেশাকে ঘিরে বিদ্যালয় থেকে বাড়ি সর্বত্র সেও কোণঠাসা হয়ে পড়ে। যদিও তার প্রতিবাদী সন্তা মাঝেমধ্যেই বেরিয়ে আসে। যেমন মামা শচীনন্দনের চোখে চোখ রেখে দাদুর সম্পত্তিতে তার মায়ের ভাগের কথা তুলে সে পুরুষতান্ত্রিক অধিকারের মূলে আঘাত করতেও পিছপা হয় না। দুলালী চায় তার মায়ের নামের জমি গোকুলকে বর্গা দিতে। কারণ অতীতে গোকুলের বাবা গগন ভাঙ্গি দুলালের দাদু বিভূতি মন্ডল এর দয়ায় কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে পাঁচ একর জমি ভাগ চাষ করত। যে পাঁচ একর জমি বিভূতি মন্ডল দুলালীর মা অন্নপূর্ণার নামে বেনামী করিয়েছিলেন। বিভূতির বিশ্বস্ত মানুষ গগন ভাঙ্গি তার একমাত্র সাক্ষী ছিলেন। কিন্তু কারো কাছে সেকথা সে কোনোদিন ফাঁস করেনি।

“মানুষ অন্ন পাত্র ফুটো করে কখনো? এমনকি সেই খরার বছরে গাঁয়ে সেটেলমেন্টের বাবুরা এসেছিলেন যখন, গগন তার কৃতজ্ঞতাকে বুকে বেঁধে রেখেছিল। একটু মুখ ফুটে বললেই, পুরো জমিটা খাস হয়ে যেত এবং গগন পেয়ে যেত ছ'বিঘা জমি নিজের নামে। সরকারের আইন অনুসারেই।”^৬

সেদিন গগনের এই বিশ্বাস না ভাঙ্গার প্রতিদানে বিভূতি মন্ডল গগনকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির তদারকির ভার দিয়েছিলেন। যে সম্পত্তির অধিকাংশই বেনামী এবং 'তিপান্ন সালের জমি-জমা সংক্রান্ত আইনে সিলিং বিরোধী।' আসলে গগনের মতো মানুষদের কাছে মূল্যবোধ ছিল চন্দ্র-সূর্যের মতো সত্যি। তারা ভাবত -

“গাঁয়ের শান্ত জীবন শুধু আইনে চলে না, সম্পর্কটাই বড় কথা।”^৭

কিন্তু বিভূতির মৃত্যুর পর সবকিছু বদলে যায়। মালিক বদল হলে কর্মচারীর বদল ঘটে। বদল ঘটে বিশ্বাসের জায়গাতেও। বিভূতি পুত্র শচীনন্দন সমস্ত সম্পত্তি পেয়ে তার ভার বাদল কর্মকার তথা বাদল ডাঙারের কাছে আমমোক্তারনামা লিখে দেয়। এরপর ভাগ চাষের সেই পাঁচ একর জমি ছাড়তে বলা হলে গগন অসহায় হয়ে পড়ে। সিপিআই(এম) কর্মী মন্মথের কাছে সে জানতে পারে তৎকালীন ভূমি সংস্কার আইনে বর্গা উচ্ছেদ করার নিয়ম নেই।

“পঞ্চগন্নার ভূমি সংস্কার আইন সত্তর সালে প্রেসিডেন্ট এন্ড অ্যামেন্ড যা করেছে বর্গা উচ্ছেদ অসম্ভব।”^৮

তাই গগন কালনা মহকুমা ফৌজদারি হাকিমের এজলাসে পিটিশন জমা দেয়। কিন্তু বাদল, শচীনন্দনের কূটকৌশলের সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব হয়নি গগনের। গ্রামের মস্তানদের দিয়ে তারা গগনের টিপসই জোর করে নিয়ে নেয় বর্গাদারী স্বত্ত্ব অর্থের বিনিময়ে ত্যাগ করার স্বীকারোক্তি লেখা একটি মিথ্যে কাগজে।

এতেও হার মানেনি গগন। পাল্টা পিটিশন সে জমা দেয় এই মিথ্যে কাগজের বিরুদ্ধে। এরপর হাকিম তার পিটিশন মন্তেস্থর থানার ওসিকে পাঠায়। কিন্তু থানার নতুন ওসির সঙ্গে বাদল ডাক্তার সমঝোতা করে শচীনন্দনকে দিয়ে ১৪৪ ধারার কেস করে গগনের বিরুদ্ধে। ঘটনা এখানেই থেমে যায়নি। এরপর চলতে থাকে গগনের বাড়ি রেড করা থেকে শুরু করে তার ওপর সশস্ত্র হামলাও। তার পরিণাম বর্তমানে গগনের দুটি অঙ্গ চোখ। এমনকি কলকাতা হাইকোর্টও গগনের অভিযোগ খারিজ করে দেয়। অবশেষে কালনায় ফিরে এসে গগন দেখে তার যুগবেড়িয়ার ঘরবাড়ি লুট হয়ে গেছে। এরপর ‘দীর্ঘ পঞ্চাশ ষাট বছরের রক্ত ঘাম স্নেহের সম্পর্ক শিকড় ছিন্ন হয়ে গগন তার নিঃস্ব সংসার, বউ ছেলেপুলে নিয়ে এখানে সেখানে নানা দেশ ঘুরে ঘুরে, কখনো কখনো ভিক্ষা নিয়ে জীবন পালন করে সাতাত্তরের পর ফিরতে পেরেছিল।’^৯

উল্লেখ্য, এই সাতাত্তরেই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে গ্রামীণ কাঠামোয় বদল ঘটায়। এপ্রসঙ্গে বাম সরকারের অপারেশন বর্গা কর্মসূচির উল্লেখ করা প্রয়োজন। যে কর্মসূচির মধ্যে ছিল -

১. জমির উর্ধ্বসীমা আইন তৈরি বা সিলিং নির্ধারণ করা।
২. উদ্বৃত্ত জমি চিহ্নিত করা।
৩. উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা।
৪. ভাগ চাষী বা বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত করা।
৫. পাট্টা প্রদান করা।
৬. পাট্টাদারদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ভূমি সংস্কার মূলক বিষয়।

এই প্রত্যেকটি বিষয়ে পঞ্চায়েতের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। বলাবাহুল্য, ১৯৭৮ সালের পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রায় ১৩ লক্ষ একরের বেশি সিলিং বহির্ভূত কৃষি জমি অধিগৃহীত হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। সেই জমির ২৭ লক্ষেরও বেশি গরিব চাষির মধ্যে বন্টনও করা হয়েছে বলে জানা যায়। অধ্যাপক পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, -

“একথা অবশ্যই ঠিক যে জমিদারি অধিগ্রহণ আইনে একজন মধ্যস্থত্বাধিকারীর কাছ থেকে শত শত একর জমি পাওয়া গেছে। কিন্তু ভূমিসংস্কার আইনে একজন রায়তের কাছ থেকে ৫/১০ একরের বেশি জমি পাওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে এখন যে জমি সরকারে ন্যস্ত হচ্ছে তার গুণগত মান খুবই ভালো এবং ৩০ ডেসিমেল জমি পেলে একটি ভূমিহীন পরিবার বেঁচে থাকার একটা জোর পেয়ে যায়। অন্তত শ্রীহীন লক্ষীছাড়া জীবন থেকে একটি গৃহস্থ জীবনে উত্তীর্ণ হতে পারে। এখন যে বন্যা খরা বা অন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলে দলে দলে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে না তার কারণ একদিকে ত্রাণকার্যে প্রশাসন ও পঞ্চায়েতের তৎপরতা, অপরদিকে ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ পরিবারের কিছু না কিছু সম্বল তৈরি হওয়া।”^{১০}

পঞ্চায়েতের এক্ষেত্রে ভূমিকা ছিল গরিব ভূমিহীন চাষিদের চিহ্নিত করা, জোতদারদের বোনামী জমি খুঁজে বের করে প্রশাসনকে সাহায্য করা, সেইসঙ্গে পঞ্চায়েতের সুপারিশে এই চাষীদের পাট্টা প্রদান এবং কৃষি কাজ সম্পন্ন করার জন্য ব্যাংক থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ পেতে সাহায্য করা। রাজ্য সরকারের এই কর্মসূচিতে সবচেয়ে বৈপ্লবিক উদ্যোগ হল বর্গাদারদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। তথ্য বলে, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১৭ লক্ষ বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত করা গেছে। ফলে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক জীবনের মান অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য উপন্যাসেও এরকম একটা ছবি দেখা যায়। দেখা যায়, ক্ষমতায় এসে পাট্টা মাধবপুরের সরকারি খাস জমিতে গগনকে বসিয়ে দিয়েছে। তার “বিলে চাষ-বাসের জন্য বিঘে চারেক জমিও বরাদ্দে জোটে।”^{১১} মাধবপুরের আরও বেশ কিছু গরিব চাষি আটাত্তরের পর সরকারি খাসজমিতে পত্তন পেয়েছে। এরপর ধীরে ধীরে তার পুত্র গোকুল পাট্টিতে আসে। যুগবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে উপপ্রধান হিসেবে কাজও করে। গগনের অতীত ঘটনা জেনে দুলালী গোকুলকে তার মায়ের জমি বর্গা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে শচীনন্দন ক্ষেপে ওঠে। মামার এককালের প্রতিপক্ষ গগন ভাঙ্গির ছেলে গোকুলের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণে বাড়ি, বিদ্যালয়, পাট্টির চাপে দুলালী শেষ পর্যন্ত হাঁপিয়ে ওঠে, অসুস্থ হয়ে পড়ে। রাজনীতির কুটিল ষড়যন্ত্র গোকুলের সঙ্গে তার সম্পর্ককে একরকম কুঁড়িতেই বিনষ্ট করে দেয়। ফলে গোটা উপন্যাস জুড়ে পঞ্চায়েত রাজনীতির উত্থান গ্রামীণ সমাজে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের নামে

রাজনৈতিক নেতাদের যে 'দাদাগিরি' টাইপ শোষণের জন্ম দিল, তার ফলে যে অর্ধ বিকশিত, অর্ধ অনুন্নত একটা গ্রাম সমাজ তৈরি হল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এই অর্ধ বিকশিত সমাজের ছায়ায় থাকা গ্রামের নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে বিচ্ছিন্নতা, বেদনাবোধ, কোনোরকমে আপোষ করে বেঁচে থাকা, অথচ তাদের মুখোশগুলো খুলে যাওয়া ইত্যাদি নানান সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ল। মানুষ ভাবছে এক, চাইছে এক, করছে এক। এমন এক বিভ্রান্তিময় জীবনে মানুষের দাম্পত্য, প্রেম থেকে যৌনতা পর্যন্ত লাভ লোকসান আর সুবিধাভোগের হাতিয়ার হয়ে উঠল। আটের দশক থেকে গ্রামীণ রাজনীতির পট পরিবর্তন গ্রামীণ মানুষের জীবনের দৈনন্দিন সংস্কৃতিকে যে ভয়ঙ্কর পথে চালিত করল উপন্যাসে সাধন চট্টোপাধ্যায় তার নিখুঁত বিবরণ দিয়েছেন।

Reference:

১. বসু, অসিত কুমার, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম প্রকাশ - জুন ১৯৮৩, পৃ. ৬৩
২. তদেব, পৃ. ৪
৩. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, উপন্যাস সমগ্র (দ্বিতীয় খন্ড), করুনা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ - কলকাতা বইমেলা ২০১২, পৃ. ১৩
৪. তদেব
৫. তদেব, পৃ. ২৬
৬. তদেব, পৃ. ৪৬
৭. তদেব, পৃ. ৪৭
৮. তদেব, পৃ. ৪৯
৯. তদেব, পৃ. ৫২
১০. বন্দ্যোপাধ্যায় পরিমল, ভূমি ও ভূমি সংস্কার সেকাল একাল, দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ - সেপ্টেম্বর ২০০৭, কলকাতা ৭০০৭৩, পৃ. ২৭৬
১১. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, উপন্যাস সমগ্র (দ্বিতীয় খন্ড), করুনা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ - কলকাতা বইমেলা ২০১২, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ পৃ. ৫২

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

চট্টোপাধ্যায়, সাধন, উপন্যাস সমগ্র (দ্বিতীয় খন্ড), করুনা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ - কলকাতা বইমেলা ২০১২, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

সহায়ক গ্রন্থ :

রায়, এম, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩, ট্যাক্স 'এন ল, ২০২৪, কলকাতা ৭০০০০১

বসু, অসিত কুমার, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম প্রকাশ- জুন ১৯৮৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল, ভূমি ও ভূমি সংস্কার সেকাল একাল, দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ২০০৭, কলকাতা ৭০০০৭৩

দাস, সঞ্জীব, সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস ক্ষমতার অন্তঃস্বর, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ - অক্টোবর ২০১৯, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯

পাল, শ্রাবণী, সত্তর উত্তর গ্রাম সমাজ ও বাংলা ছোট গল্প, একুশ শতক, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০২২, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১